

ফুটেস্টেপস অব প্রোফেট ﷺ

(মহানবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবন থেকে নেওয়া মহান শিক্ষা)

মূল	তারিক রমাদান
ভাষান্তর	রোকন উদ্দিন খান



গার্ডিয়ান

পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

ভূমিকা	১৩
ঐশী জ্ঞান	১৯
জন্ম ও শিক্ষা	২৮
ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান	৩৯
ওহি ও জ্ঞান	৫০
বিরোধিতার ঝড়	৬১
প্রতিরোধ ও নির্বাসন	৭৮
পরীক্ষা, উর্ধ্বগমন ও আশার আলো	৯৪
হিজরত	১১৬
যুদ্ধবিগ্রহ	১৩৩
প্রশিক্ষণ ও পরাজয়	১৫৩
প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা	১৭৬
স্বপ্ন ও শান্তি	২০১
ঘরে ফেরা	২১৮
বিজয়ের পর	২৩৭
দায়মুক্তি	২৫৯
অনন্ত ইতিহাসে	২৭৩

ঐশী জ্ঞান

ইসলামের একত্ববাদ দাঁড়িয়ে আছে নবুয়তের ধারাবাহিকতার ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে। সৃষ্টির শুরু থেকে এক আল্লাহ তায়ালা মানুষের কাছে অনেক নবি ও রাসূল প্রেরণ করেছেন—যারা আল্লাহর কথা, তাঁর নির্দেশ ও তাঁর ভালোবাসার কথা মানুষকে মনে করিয়ে দিতেন। মুসলিম জাতি প্রথম মানব ও নবি আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবি ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত সকল নবি ও রাসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁদের নবুয়তের স্বীকৃতি দেয়। এই তালিকায় রয়েছেন ইবরাহিম (আ.), নুহ (আ.), মুসা (আ.) ঈসা (আ.) সহ অসংখ্য নবি ও রাসূল—যাদের অনেকের নাম আমরা জানি না। সৃষ্টির শুরু থেকে এক আল্লাহ আমাদের জন্য একের পর এক তাঁর দূত পাঠিয়েছেন। কোনো দূতের শিক্ষা দুনিয়া থেকে একেবারে মুছে গেলে আবার একজনকে পাঠিয়েছেন। এটি তাওহিদ (আল্লাহর একত্ববাদ) ও কুরআনিক সূত্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ, যেখানে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে—আমরা আল্লাহরই জন্য এবং তাঁর দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।^১

বংশপরিচয়

সকল নবি-রাসূলের মধ্যে ইবরাহিম (আ.)-এর বংশধারা সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ; যে বংশধারার শেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ। পবিত্র কুরআনে ইবরাহিম (আ.)-এর এই বংশধারার তাওহিদের প্রতি একনিষ্ঠতার ওপর বারবার আলোকপাত করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে, ঐশী বিষয়াবলির প্রতি মানুষের আগ্রহ চিরন্তন। আর মানুষের আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের যে প্রবণতা, তা মূলত আরোপিত নয়; বরং স্বৈচ্ছাপ্রণোদিত। এটাই ইসলামের প্রকৃত অর্থ। ইসলামের একটি ভুল অর্থ করা হয় এমন যে, ইসলাম অর্থ শুধুই আত্মসমর্পণ। কিন্তু এ অর্থের সাথে দুটি অনুষঙ্গকে যুক্ত না করলে ইসলাম শব্দটির অর্থ খণ্ডিত থেকে যায়। এর একটি হলো শান্তি, অন্যটি হলো স্বৈচ্ছায় আত্মসমর্পণ। এ অর্থই সৃষ্টির শুরু থেকে মুসলিমরা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করে চলেছে। এই দিক থেকে ইবরাহিম (আ.) ছিলেন মুসলিমদের জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পবিত্র আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে—

‘তিনি তোমাদের বেছে নিয়েছেন। তিনি তোমাদের দ্বীনের ওপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি। এটাই তোমাদের পিতা ইবরাহিমের দ্বীন। আল্লাহ তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম— আগেও এবং এ কিতাবেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় এবং তোমরা সাক্ষী হও মানবজাতির জন্য।’^২

মহান আল্লাহ কর্তৃক ইবরাহিম (আ.)-এর এই স্বীকৃতির কারণে ইবরাহিম (আ.) নবিদের সারিতে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। পবিত্র কুরআনের মতোই ‘বুক অব জেনেসিসে’ও (প্রাচীন বাইবেল) ইবরাহিম (আ.) ও বিবি হাজেরার ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে, যেখান থেকে জানা যায়, বৃদ্ধা বয়সে বিবি হাজেরা ইবরাহিম (আ.)-এর প্রথম পুত্র সন্তান ইসমাইল (আ.)-এর জন্ম দেন।^৩ ইবরাহিম (আ.)-এর প্রথম স্ত্রী সারাহ, (যার গর্ভে ইসহাক আ.-এর জন্ম হয়) ইবরাহিম (আ.)-কে বলেন, তিনি যেন বিবি হাজেরা ও ইসমাইল (আ.)-কে বাইরে কোথাও রেখে আসেন।

ইবরাহিম (আ.) বিবি হাজেরা ও শিশুপুত্র ইসমাইল (আ.)-কে নিয়ে ‘বাক্কা’ নামক আরবের একটি উপত্যকায় চলে যান—যার বর্তমান নাম মক্কা। বাইবেল ও কুরআন উভয় গ্রন্থেই বিবি হাজেরার নির্বাসন এবং ইবরাহিম (আ.)-এর সাথে বিচ্ছেদের এই ঘটনাগুলো বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম, ইহুদি ও খ্রিষ্টান— তিনটি ধর্মেরই অনুসারীরা ইবরাহিম (আ.), বিবি হাজেরা ও ইসমাইল (আ.)-এর আল্লাহর আনুগত্যের বিষয়টি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে থাকে। ইবরাহিম (আ.) পুত্র ইসমাইল (আ.)-এর জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলে আল্লাহ সেই প্রার্থনার জবাবে যা বলেছেন, তা বাইবেলে এভাবে উল্লেখিত হয়েছে—

‘ইসমাইলের জন্য তোমার প্রার্থনা আমি শুনেছি। আমার করুণাধারা তাঁর প্রতি বর্ষিত হবে। আমি তাঁর সন্তান-সম্ভতির সংখ্যা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবো এবং তাঁর মধ্য থেকে এক মহান জাতির উন্মেষ ঘটবে।’^৪

২. সূরা হাজ : ৭৮

৩. বুক অব জেনেসিস ১৫ : ৫

৪. বুক অব জেনেসিস ১৭ : ২০

ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান

মুহাম্মাদ ﷺ-এর দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁর জীবনের শেষ বছরগুলোতে ধন-সম্পদ হারিয়ে দারিদ্র্যের মুখোমুখি হন। বালক মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরবর্তী অভিভাবক চাচা আবু তালিবের আর্থিক অবস্থাও তেমন সচ্ছল ছিল না। তাই পিতৃ-মাতৃহীন বালক মুহাম্মাদ ﷺ খুব অল্প বয়সে জীবিকা অর্জনের কাজে নেমে পড়েন এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন।

পাদরি বাহিরা

মুহাম্মাদ ﷺ-এর বারো বছর বয়সে চাচা আবু তালিব তাঁকে নিয়ে সিরিয়া অভিযাত্রী একটি বাণিজ্য কাফেলার সাথে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে তাঁরা বুশরা নামক একটি স্থানে যাত্রাবিরতি করলেন। স্থানটির পাশেই ছিল একটি জনবসতি এবং সেখানে বাহিরা নামে একজন খ্রিষ্টান পুরোহিত বাস করতেন। ওয়ারাকাহ ইবনে নওফেল, সেই সময়কার খ্রিষ্টান, ইহুদি ও আরব উপত্যকার অন্যান্য হুনাফাদের মতো সন্ন্যাসী বাহিরাও একজন নবির আগমনের প্রতীক্ষা করতেন এবং তাঁর আগমনের নানা নিদর্শন প্রত্যক্ষ করছিলেন।^৫

বাহিরা যখন সিরিয়া অভিযাত্রী বাণিজ্য কাফেলাটির দেখা পেলেন, তখন লক্ষ করলেন, এক টুকরো মেঘ সেই কাফেলাকে ছায়া দিয়ে যাচ্ছে এবং সূর্যের প্রখর তাপ থেকে কাফেলার যাত্রীদের রক্ষা করে চলেছে। বাহিরা এ ঘটনার রহস্য জানতে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। তিনি সন্ন্যাসীদের রীতি ভেঙে কাফেলার যাত্রীদের একবেলা খাবার গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। কাফেলার সব যাত্রীদের নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ শেষে বালক মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর তাঁর চোখ আটকে গেল। বাহিরা মুহাম্মাদ ﷺ-কে তাঁর পাশে বসিয়ে তাঁর পারিবারিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থান, স্বপ্ন ইত্যাদি সম্পর্কে অনেকগুলো প্রশ্ন করলেন। এরপর বাহিরা নবিজিকে তাঁর পিঠ দেখাতে অনুরোধ করলেন। বালক মুহাম্মাদ ﷺ রাজি হলেন। খ্রিষ্টান পুরোহিত বাহিরা বালক মুহাম্মাদ ﷺ-এর দুই স্কন্ধের হাড়ের মাঝে চামড়ার ওপর সামান্য স্ফীত একটি নিদর্শন দেখতে পেলেন—যেটিকে তিনি ‘খাতামুন নাবিয়্যিন’ বা ‘নবুয়্যতের সিলমোহর’ বলে চিনতে পারলেন। বাহিরা নবিজির চাচা আবু তালিবকে এই বলে সতর্ক করে দিলেন যে, এই বালকটির জন্য এক বিস্ময়কর ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। তিনি আবু তালিবকে বললেন—তিনি যেন তাঁর ভতিজাকে দেখে শুনে রাখেন এবং সকল প্রতিকূলতা ও বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন। বাহিরা জানতেন, সব নবিকেই দুনিয়াতে বিপুল বাধা-প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাই মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনেও যে এমনটি ঘটবে—তা তিনি তখনই অনুমান করতে পেরেছিলেন।

আমরা পূর্বেই দেখেছি, মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনের প্রথম বছরগুলোতে তাঁকে ঘিরে বহু নিদর্শন আবর্তিত হতো, যা দেখে আশপাশের সবাই বুঝতে পারত— এই শিশুটি অন্য শিশুদের চাইতে আলাদা এবং তাঁর সামনে একটি ব্যতিক্রমী ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। খ্রিষ্টান পুরোহিত বাহিরা বালক মুহাম্মাদ ﷺ-কে দেখে নিশ্চিত ছিলেন যে, এই শিশুটি হবে নবিদের ধারাবাহিকতার শেষ নবি। ১২ বছর বয়সি মুহাম্মাদ ﷺ জানতে পারলেন—তাঁর চারপাশের যে লোকেরা আজ তাঁকে ভালোবাসা উপহার দিচ্ছে, তারাই একসময় তাঁর প্রতিপক্ষ হয়ে উঠবে। তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততার জন্য যে লোকগুলো তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসত, সেই লোকগুলোই ভবিষ্যতে তাঁকে হত্যা করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে।

মক্কার পাহাড়ি এলাকায় ভেড়া চরিয়ে কিশোর মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরবর্তী কয়েকটি বছর কাটল। যদিও তিনি সে সময় বয়সে ছোটো ছিলেন এবং মক্কার লোকালয়ের প্রাণচঞ্চল জীবন থেকে দূরে অবস্থান করতেন, তবুও তিনি মক্কার বিভিন্ন গোত্র ও জোটের মধ্যে ধারাবাহিক যুদ্ধ-বিগ্রহের খবর জানতে পারতেন। মক্কায়ে সে সময় গোত্র ও বংশগত লড়াই ছিল স্বাভাবিক ও চিরচেনা দৃশ্য। কিছু অসৎ লোক এ লড়াইয়ের সুযোগে ব্যবসায়ী, পথচারী ও দর্শনার্থীদের সর্বস্ব লুটে নিত। কারণ, তারা জানত—এই লোকেরা কোনো গোত্র বা জোটের সাথে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ নয়, তাই তাদের সাহায্যে কেউ এগিয়ে আসবে না। ইয়েমেন থেকে আগত এক ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটল। তার বিক্রিত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য না দিয়ে তার ওপর অন্যায় করা হলো। কিন্তু সেই ব্যবসায়ী ছেড়ে দেওয়ার পাত্র ছিল না। সে জনসম্মুখে তার সাথে করা অন্যায়ের কথা প্রচার করতে লাগল এবং কুরাইশ নেতাদের কাছে বিচারের জন্য দ্বারস্থ হলো।^৬

হিলফুল ফুজুল

মক্কার তাইম গোত্রের প্রধান ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে জুদআন নামে এক ব্যক্তি। তিনি মক্কার বড়ো দুটি গোত্রীয় জোটের একটির সদস্য ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে জুদআন যুগ যুগ ধরে চলে আসা গোত্রীয় সংঘাত কী করে বন্ধ করা যায়—তা নিয়ে গভীর ভাবনায় নিমগ্ন ছিলেন। যারা সংঘাত-সংঘর্ষ, কলহ-বিবাদ, রক্তপাত বন্ধ করতে চায়, এমন লোকদের তিনি একদিন তাঁর ঘরে নিমন্ত্রণ করলেন এবং পরস্পরের প্রতি সম্মান ও ন্যায়বিচার প্রদর্শনের নীতির ভিত্তিতে একটি মৈত্রী চুক্তি প্রতিষ্ঠা করলেন—যা ছিল সকলের গোত্রীয়, রাজনৈতিক বা বাণিজ্যিক স্বার্থের উর্ধ্বে।

এভাবে বিভিন্ন গোত্র এই শর্তে অঙ্গীকারবদ্ধ হলো যে, তারা নিপীড়কের বিপক্ষে এবং নিপীড়িতের পক্ষে অবস্থান নেবে—নিপীড়নকারী যে-ই হোক না কেন; এমনকী সে তাদের আপন গোত্র বা জোটের লোক হলেও। এই মৈত্রীচুক্তির নাম ছিল ‘হিলফুল ফুজুল’। এর উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতা-প্রভাব-গোত্র-বংশ ইত্যাদির উর্ধ্বে উঠে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং নিপীড়িত মানবতার সাহায্যে

৬. কুরাইশ ছিল মক্কার একটি প্রভাবশালী বংশ। কুশাই নামক একজন স্বনামধন্য ব্যবসায়ীর উত্তরাধিকার হলো কুরাইশ বংশ।

এগিয়ে আসা। কিশোর মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর আজীবনের বন্ধু আবু বকর (রা.) সেই ঐতিহাসিক শপথ-সভায় অংশ নিয়েছিলেন।

এ ঘটনার অনেক পরে মুহাম্মাদ ﷺ যখন তাঁর নবুয়তের দায়িত্ব পালন করছিলেন, তখন একদিন তিনি ঘটনাটিকে এভাবে স্মরণ করেন—

‘আবদুল্লাহ ইবনে জুদআনের বাড়িতে যখন মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। এটি এত চমৎকার ঘটনা ছিল যে, একপাল লাল উটের বিনিময়েও আমি সেখানে উপস্থিত থাকা থেকে বিরত থাকাকে পছন্দ করতাম না। আর এখন ইসলামি যুগেও যদি কেউ আমাকে সে রকম কোনো মৈত্রীচুক্তির অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানায়, তাহলে আমি সানন্দে তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করব।’^৭

মহানবি মুহাম্মাদ ﷺ সেই মৈত্রীচুক্তির বিষয়বস্তুর ওপরই শুধু গুরুত্বারোপ করেননি; বরং তিনি একধাপ এগিয়ে বলেছেন, এমনকী আল্লাহর রাসূল হিসেবেও তিনি অনুরূপ কোনো চুক্তি-অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করবেন। মুহাম্মাদ ﷺ-এর এই ঘোষণায় মুসলিমদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বার্তা রয়েছে এবং এখান থেকে কমপক্ষে তিনটি শিক্ষা পাওয়া যায়।

প্রথমত, মুহাম্মাদ ﷺ এমন একটি মৈত্রীচুক্তির স্বীকৃতি দিলেন—যা সম্পাদিত হয়েছিল তাঁর ওপর ওহি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে। যে চুক্তিতে সকল মানুষের জন্য ন্যায়বিচার ও নিপীড়নের প্রতিবাদ করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথায় এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সেই চুক্তির বিষয়বস্তুগুলো শুধু ইসলামপূর্ব যুগের জন্য প্রযোজ্য নয়; বরং কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পরের যুগের জন্যও প্রযোজ্য। দেখা যাচ্ছে, মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি থেকে উদ্গত শান্তিচুক্তির বিষয়বস্তুকে ইসলাম অনুমোদন করেছে। রাসূল ﷺ পরিস্কারভাবে ন্যায়বিচার ও নিপীড়িতের অধিকারের পক্ষে করা ইসলামপূর্ব যুগের শান্তিচুক্তিকে অনুমোদন ও স্বীকৃতি দিয়েছেন।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওই ঘোষণায় দ্বিতীয় যে শিক্ষাটি রয়েছে, তা-ও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। মুসলিম নয় এমন লোকদের দ্বারা ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত চুক্তিকে রাসূল ﷺ অনুমোদন প্রদান করেছেন। ইসলামি রীতি-নীতির ভিত্তিতে সম্পাদিত বা মুসলিমদের দ্বারা সম্পাদিত চুক্তিই কেবল নৈতিকভাবে বৈধ—অনেক মুসলিমের এমন ধারণার ভিত্তিমূলে নবিজির ওই ঘোষণা হলো একটি বড়ো কুঠারাঘাত। রাসূল ﷺ স্পষ্টভাবে বলে গেছেন, শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এবং মজলুমকে রক্ষার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত চুক্তি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য; হোক তা ইসলামের ভেতরে বা বাইরে।

তৃতীয় শিক্ষাটি হলো—ইসলামের মানবিক মূল্যবোধ সংকীর্ণ কোনো ধারণা নয় এবং শান্তি, নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে অন্যান্য মূল্যবোধের সাথে ইসলামি মূল্যবোধের কোনো বিরোধ নেই। মহানবি ﷺ বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন, আরব ও অনারবের মধ্যে কেউ একে অপরের চাইতে শ্রেষ্ঠ নয়। ‘অপর’ মানেই তার ন্যায়বিচার পাওয়ার কোনো অধিকার নেই—এই অন্যায়

ধারণার বিপরীতে ইসলাম এবং মহানবি ﷺ শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেছেন। ইসলাম কোনো সংকীর্ণ ধর্ম নয়; বরং মানুষের শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যশীল একটি ধর্ম। ইসলামের মর্মকথাই হলো ন্যায়বিচার—যার কেন্দ্রে রয়েছে জুলুমের প্রতিরোধ এবং মজলুমের জান-মাল-সম্মান রক্ষা। এই বিষয়বস্তুর ভিত্তির ওপর নির্মিত যেকোনো চুক্তি গ্রহণযোগ্য, সেটির সম্পাদনকারী মুসলিম-অমুসলিম যে-ই হোক না কেন এবং তা মুসলিম-অমুসলিম যে সমাজেই রচিত হোক না কেন।

সংকীর্ণ অর্থে ধর্ম পালন নয়; বরং ইসলামের প্রাণসত্তাকে অনুধাবন করে এর বিশ্বজনীন ও কালোত্তীর্ণ শিক্ষাকে ধারণ করার শিক্ষা রাসূল ﷺ আমাদের দিয়ে গেছেন। তাঁর ওই ঘোষণায় মানুষের জান-মাল-সম্মান সংরক্ষণ, ন্যায়বিচার ও মানুষে মানুষে সাম্যের কথাই বলা হয়েছে। মানবীয় নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্য একসময় বলেছেন, ‘ইসলামপূর্ব যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলো ইসলামি যুগেও শ্রেষ্ঠ; যদি তারা ইসলামের জ্ঞান অনুধাবন করে।’^৮ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথার অর্থ হলো—একজন নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ তখনই মনুষ্যত্বের চূড়ায় উঠতে পারবে, যখন সে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করবে।

সত্যবাদিতা ও বিয়ে

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় জীবন থেকে যে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে উঠে আসে, তা হলো—নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে থেকেই তাঁর চরিত্রে উচ্চতর নৈতিক গুণাবলির অস্তিত্ব ছিল; যে গুণগুলো তাঁর নবুয়তের দায়িত্ব পালনের জন্য অপরিহার্য ছিল। রাখাল বালক মুহাম্মাদ ﷺ-কে কিছু বছর পরেই একজন তরুণ ব্যবসায়ীর ভূমিকায় দেখা গেল এবং তাঁর সততা ও দক্ষতার নৈপুণ্যের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মুহাম্মাদ ﷺ-এর বয়স যখন ২০ এর কোঠায়, তখন লোকেরা তাঁকে ‘আস-সাদিক’ (সত্যবাদী) ও ‘আল আমিন’ (বিশ্বাসী) বলে ডাকত। মক্কায় সে সময় খাদিজা বিনতে খুযাইলিদ (রা.) নামে একজন ধনাঢ্য নারী ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি ছিলেন বিধবা। এর আগে তাঁর দুবার বিবাহ হয়েছিল। খাদিজা (রা.) ছিলেন খ্রিষ্টান ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের চাচাতো বোন। কয়েক বছর থেকে খাদিজা (রা.) তরুণ মুহাম্মাদ ﷺ-এর সততা, বিশ্বস্ততা ও দক্ষতার গল্প শুনে আসছিলেন। তিনি তরুণ মুহাম্মাদ ﷺ-কে যাচাই করে দেখতে চাইলেন। তিনি তাঁকে সিরিয়ায় গিয়ে কিছু পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের প্রস্তাব এবং বিনিময়ে দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন। মুহাম্মাদ ﷺ এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। খাদিজা (রা.) তাঁর একজন দাস মাইশারাকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথে প্রেরণ করলেন। তরুণ মুহাম্মাদ ﷺ মাইশারাকে সাথে নিয়ে পণ্যদ্রব্যসহ সিরিয়ার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলেন। সিরিয়াতে মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিচালিত বাণিজ্য দারুণভাবে সফল হলো। তিনি খাদিজা (রা.)-এর অনুমানের চাইতে দ্বিগুণ মুনাফা অর্জন করলেন।

যুদ্ধবিগ্রহ

মহানবি ﷺ ও মক্কা থেকে আগত মুসলিমরা ধীরে ধীরে মদিনায় বসতি গড়ে স্থায়ী হওয়া শুরু করলেন। মদিনার জীবনের প্রথম সাত মাস মহানবি ﷺ আবু আইয়ুব (রা.) নামে এক আনসার মুসলিমের বাড়িতে মেহমান হিসেবে থাকলেন। এই সময়ের মধ্যে মসজিদে নববি ও মসজিদে সংলগ্ন কুটির ঘর নির্মাণ শেষ হলে মহানবি ﷺ স্ত্রী সাওদা (রা.)-কে নিয়ে তাঁর জন্য নির্মিত কুটির ঘরে গিয়ে উঠলেন। কয়েক মাস পর মদিনায় আয়িশা (রা.)-এর বিবাহ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হলো এবং তিনি মহানবি ﷺ-এর কাছে চলে এলেন। কয়েক সপ্তাহ পর মুহাম্মাদ ﷺ-এর কন্যারাও মদিনায় এসে পৌঁছালেন।

মোটামুটি কঠিন একটি পরিবেশে একটি নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলো। মদিনার শান্তিচুক্তি ও গোত্রগুলোর জোট সত্ত্বেও আন্তঃগোত্রীয় কলহ ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রায়শই মুসলিম ও বিভিন্ন গোত্রের লোকদের পারস্পরিক সম্পর্কে জটিল করে তুলত। মাঝে মাঝে মুসলিমদের মধ্যেও ক্ষণিকের জন্য পুরোনো জাহেলিয়াত, রেষারেষি ও শত্রুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠত। ফলে দুটি পক্ষ তৈরি হয়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ত। অবশ্য সাহাবিরা কখনোই ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা ভুলে যাননি। মহানবি মুহাম্মাদ ﷺ সব সময় তাঁদের ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা মনে করিয়ে দিতেন। ফলে এই অভ্যন্তরীণ সংকট এড়ানো গেছে।

এদিকে মক্কায় তীব্র অসন্তোষ দেখা দিলো। মহানবি মুহাম্মাদ ﷺ ও মুসলিমদের মদিনায় বসতি গড়ার খবর সমগ্র আরবে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর এটি ছিল মক্কার কুরাইশদের জন্য ভীষণ অপমানজনক। তারা দেখল, আরবে ক্ষমতার ভারসাম্যের সামনে নতুন মুসলিম সমাজটি একটি বড়ো হুমকি হয়ে দাঁড়াতে যাচ্ছে। বহু যুগ ধরে কুরাইশরা ছিল আরবের স্বীকৃত ও ক্ষমতাবান গোত্র। পবিত্র শহর মক্কা ও পবিত্র কাবা ঘরের নিয়ন্ত্রণ ছিল তাদের হাতে। হজ ও বাণিজ্যমেলায় অংশ নিতে প্রতিবছর সমগ্র আরব থেকে লোকেরা এই শহরে এসে জড়ো হতো। মক্কায় এ সবই অনুষ্ঠিত হতো কুরাইশদের নেতৃত্বে। মুসলিমরা মক্কা ত্যাগ করে ভিনদেশে নতুন সমাজ গড়ে তোলায় কুরাইশদের ক্ষমতা, নেতৃত্ব ও সম্মান প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে গেল। মহানবি ﷺ ও তাঁর সাহাবিরা এটি ভালো করেই জানতেন। মক্কার কুরাইশদের সম্পর্কে মুসলিমদের কোনো কিছুই অজানা ছিল না। তাই তাদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে—তা মহানবি ﷺ ও মুসলিমরা অনুমান করতে পারছিলেন।

কুরাইশদের সাথে বাদানুবাদ

মক্কার সব মুসলিম মদিনায় চলে যেতে পারেননি। মহানবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর প্রতিশোধ নিতে কুরাইশরা মক্কা থেকে যাওয়া মুসলিমদের ওপর নিষ্ঠুর নিপীড়ন শুরু করল। মক্কায় এমন কিছু মুসলিম ছিলেন, যারা তাঁদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেননি। মক্কা থেকে যাওয়া মুসলিমরা আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন এই ভয়ে যে, তাঁদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ হয়ে গেলে তাঁদের ওপরও ভয়াবহ অত্যাচারের খড়গ নেমে আসবে।

কিছু কুরাইশ নেতা আরবের সব রীতি-নীতি ভেঙে মক্কা ত্যাগকারী মুসলিমদের রেখে যাওয়া সহায়-সম্পদগুলো দখল করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। এ খবর মদিনায় পৌঁছলে মহানবি মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সাহাবিরা দারুণ ক্ষুব্ধ হলেন। এটি ছিল হিজরতের ছয় মাস পরের ঘটনা। মুসলিমরা কুরাইশদের সেই হীন সিদ্ধান্তের বিপরীতে মদিনার পাশ দিয়ে চলাচল করা মক্কার বিভিন্ন কাফেলাকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল—যাতে তাদের হারানো মালামালের ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায়। সেই সময় মহানবি মুহাম্মাদ ﷺ সাতটি অভিযান সংগঠিত করেন। তিনি নিজে এগুলোর সবগুলোতে উপস্থিত ছিলেন না।^৯

এ অভিযানগুলোতে শুধু মুহাজিরদেরই রাখা হয়েছিল। কারণ, তাঁরাই ছিল কুরাইশদের সম্পত্তি দখলের শিকার। আনসারদের এ অভিযানগুলো থেকে দূরে রাখা হয়েছিল। এ অভিযানগুলোতে কোনো হত্যাকাণ্ড বা রক্তপাতের ঘটনা ঘটেনি। বাণিজ্য কাফেলাগুলো থেকে মালামাল রেখে দিয়ে কাফেলার ব্যবসায়ীদের ছেড়ে দেওয়া হতো। কখনো কখনো এমন হয়েছে, মক্কার কাফেলা যেখানে থামার কথা, মুহাজিররা সেখানে পৌঁছতে দেরি করে ফেলেছে এবং কাফেলা ইতোমধ্যে রওয়ানা হয়ে গেছে, ফলে অভিযান হয়েছে নিষ্ফল। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অভিযানগুলো সফল হয়েছে এবং মুসলিমরা প্রচুর ধন-সম্পদ নিজেদের দখলে আনতে পেরেছে; যেগুলো মূলত ছিল তাঁদের ক্ষতিপূরণ।

সেই সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও কয়েকটি মিশন প্রেরণ করেন, যেগুলোর লক্ষ্য ছিল কুরাইশদের গতিবিধির ওপর নজর রাখা, তাদের সামরিক কর্মকাণ্ড ও জোট গঠনের তৎপরতার তথ্য সংগ্রহ করা। মুসলিমদের সাথে কুরাইশদের শত্রুতা তখন এতখানি বেড়ে গিয়েছিল যে, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মুসলিমদের এ রকম একটি মিশন আচমকা একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসল। আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি ছোটো দলকে কুরাইশদের খুব কাছে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থানে, নাখলাহ উপত্যকায় প্রেরণ করা হয়েছিল। এ দলটির কাজ ছিল কুরাইশ নেতাদের পরিকল্পনার তথ্য সংগ্রহ করা। কিন্তু তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ লঙ্ঘন করে কুরাইশদের একটি বাণিজ্য কাফেলার ওপর আক্রমণ করে বসল। আরবের সব গোত্র তখন চারটি মাসকে পবিত্র মাস হিসেবে মেনে চলত। এ সময় সব ধরনের যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল নিষিদ্ধ। মক্কার কাফেলার ওপর আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.)-এর

৯. ইসলামের স্ফূর্তিগণ মহানবি ﷺ-এর অভিযানগুলোকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেগুলোতে মহানবি ﷺ নিজে উপস্থিত ছিলেন না, সেগুলোকে বলা হয় ‘আস-সারিয়াহ’। যেগুলোতে মহানবি ﷺ নিজে উপস্থিত ছিলেন, সেগুলোকে বলা হয়, ‘গাজওয়া’।

আক্রমণের ঘটনা যেদিন ঘটেছিল, সে দিনটি ছিল রজব মাসের শেষ রাত। আর রজব মাস ছিল সেই চারটি মাসের মধ্যে একটি। আক্রমণে একজন কুরাইশ নিহত হয়, দুজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় এবং অপর দুজনকে বন্দি করা হয়। আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.) মদিনায় ফিরে এলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সব শুনে ভয়ানক রেগে গেলেন। এ ঘটনায় মক্কা ও মদিনার সম্পর্ক নতুন মোড় নিল।

এক বছরেরও বেশি সময় ধরে রাসূলুল্লাহ ﷺ লোহিত সাগরের উপকূলে বসবাসরত গোত্রগুলোর সাথে সন্ধি করে আসছিলেন। ফলে সিরিয়ামুখী পথের ওপর মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। এটি ছিল মক্কার কুরাইশদের জন্য ছিল মাথাব্যথার কারণ। কেননা, এ পথ ধরেই মক্কার বাণিজ্য কাফেলা মদিনা অতিক্রম করে উত্তরে ইরাক বা সিরিয়ার দিকে যাত্রা করত। পবিত্র মাসে কুরাইশদের ওপর আক্রমণ ও রক্তপাতের ঘটনায় কুরাইশরা সমগ্র আরবে মুসলিমদের ব্যাপারে বদনাম ছড়িয়ে দেওয়ার একটি জুতসই অস্ত্র হাতে পেয়ে গেল। ওই ঘটনাকে পুঁজি করে কুরাইশরা আরবের সবগুলো গোত্রকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টায় নিয়োজিত হলো। শীঘ্রই মুসলিম গোয়েন্দা দলগুলোর থেকে আসন্ন অনিবার্য সংঘর্ষের খবর মদিনায় আসতে শুরু করল।

ওহি

এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর দুটি ওহি অবতীর্ণ হয়, যার প্রকৃতি ছিল একেবারে ভিন্ন; মুসলিমদের অতীতের গৃহীত নীতির সমাপ্তির ঘোষণা। তেরো বছরেরও বেশি সময় ধরে কুরাইশদের নির্যাতনের মুখে মুসলিমরা ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রদর্শন করে এসেছে। মুসলিমরা মার খেয়েছে, সহায়-সম্পদ হারিয়েছে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কটের শিকার হয়েছে এবং অবশেষে মাতৃভূমি ত্যাগ করে অজানার পথে বেরিয়ে পড়েছে, কিন্তু কুরাইশদের আঘাতের জবাবে পালটা আঘাত না হেনে ধৈর্য ও নীরবতা অবলম্বন করে সংঘর্ষ এড়ানোই ছিল মুসলিমদের গৃহীত নীতি।

প্রশিক্ষণ ও পরাজয়

নানা সংকট অতিক্রম করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদিনার জীবন এগিয়ে চলল। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যকার সম্পর্কের জটিল সমীকরণকে নিপুণভাবে পরিচালনা এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য শত্রুদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখার পাশাপাশি তিনি প্রাপ্ত ওহির আলোকে ইসলামের জীবন বিধানের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপস্থিতি সাহাবিদের আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার প্রেরণা জোগাত। সাহাবিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে মৌমাছির মতো ভিড় করতেন। তাঁরা তাদের সময়ের অধিকাংশটা জুড়ে নবিজির পাশে থাকার চেষ্টা করতেন। তাঁর মুখ নিঃসৃত মূল্যবান কথা শুনতেন, নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করতেন। সাহাবিরা তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। এ ভালোবাসা ছিল নিজের প্রাণের চাইতেও অধিক। নবিজিও সাহাবিদের হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতেন। তাঁদের পারস্পরিক ভালোবাসার বন্ধনের উৎস ছিল আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা।

বিনয়, যত্ন ও ভালোবাসা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রাত্যহিক জীবন ছিল ব্যস্ততায় মুখর। শত্রুদের আক্রমণ, মদিনার কিছু ইহুদি ও মুনাফিকদের বিশ্বাসঘাতকতা, মক্কার কুরাইশদের প্রতিশোধের তৃষ্ণা—সবকিছুকেই তাঁর সামলে চলতে হতো। এসবের পাশাপাশি তিনি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা খুঁটিনাটি বিষয়ের সমাধান দিতেন। লোকদের ক্ষমা, উদারতা ও বিনয়ের প্রশিক্ষণ দিতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীরা ও সাহাবিরা লক্ষ করতেন, তিনি রাতের বেলা দুনিয়ার সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী দীর্ঘ সময় ধরে নামাজ পড়তেন। এটি ছিল মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরির সবচাইতে উপযুক্ত মাধ্যম।

আয়িশা (রা.) অবাক হয়ে নবিজিকে জিজ্ঞেস করতেন—‘আপনি কেন এত বেশি ইবাদত করছেন, যেখানে আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন?’ জবাবে তিনি বলতেন—‘আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?’^{১০} নবিজি নিজে যতখানি নামাজ পড়তেন, রোজা রাখতেন কিংবা অন্যান্য ইবাদত করতেন, সাহাবিদের ততখানি ইবাদত করার জন্য জোর প্রয়োগ করতেন না। তিনি বরং মুসলিমদের জন্য সবকিছু সহজ করে দিতেন। অতিরিক্ত ইবাদতের বোঝা তাঁদের ওপর চাপাতেন না।

একবার কয়েকজন সাহাবি যেমন : উসমান ইবনে মাজউন (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তাঁরা বিয়ে করবেন না; বাকি জীবনের সারা রাত নামাজ পড়বেন আর সারাদিন রোজা রাখবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা শুনে বললেন—‘এমনটি করো না।

কিছুদিন রোজা রাখো এবং কিছুদিন পানাহার করো। রাতের কিছু অংশে নামাজ পড়ো আর কিছু অংশে ঘুমাও। তোমার কাছে তোমার শরীরের অধিকার রয়েছে, তোমার চোখের অধিকার রয়েছে, তোমার স্ত্রীর অধিকার রয়েছে, এমনকী তোমার মেহমানেরও অধিকার রয়েছে।”^{১১}

অন্য একদিন তিনি তিনবার বললেন—‘তার ধ্বংস হোক, যে বাড়াবাড়ি করে (ইবাদতে কঠোরতা অবলম্বন করে)।’^{১২} আর একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন—‘মধ্যমপস্থা! মধ্যমপস্থা! যারা মধ্যমপস্থা অবলম্বন করে, কেবল তারাই সফল হবে।’^{১৩}

ঈমানদারদের মধ্যে যারা নিজেদের ভুল-ত্রুটি নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করত, তিনি তাঁদের ভয় দূর করে সাহস দিতেন। একদিন হানজালা নামে এক সাহাবি আবু বকর (রা.)-এর কাছে গিয়ে বললেন—‘তাঁর ধারণা, তিনি মুনাফিক হয়ে গেছেন। কারণ, যখন তিনি নবিজির সাথে থাকেন, তখন যেন তিনি জান্নাত ও জাহান্নামকে স্বচক্ষে দেখতে পান। কিন্তু যখন তিনি নবিজির কাছ থেকে চলে যান, স্ত্রী-সন্তান ও দৈনন্দিন কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তখন তাঁর মনে পূর্বের সে অনুভূতি থাকে না। আবু বকর (রা.) বললেন, তাঁর নিজের অবস্থাও একই রকম।

অতএব, তাঁরা দুজনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বললেন—‘যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ! আমার সঙ্গে থাকার সময় তোমাদের ভেতর যে অনুভূতির তৈরি হয়, তা যদি তোমাদের মধ্যে সব সময় বিরাজ করত আর তোমরা যদি আল্লাহকে স্থায়ীভাবে স্মরণ করতে পারতে, তাহলে ফেরেশতারা তোমাদের বিছানায় ও রাস্তায় তোমাদের সাথে মুসাফাহ করত। কিন্তু হে হানজালা! বিষয়টি এমন নয়। কিছু সময় এই কাজের জন্য (ইবাদত ও আল্লাহর স্মরণ) এবং কিছু সময় ওই কাজের জন্য (বিশ্রাম ও বিনোদন)।’^{১৪} রাসূলুল্লাহ ﷺ নিশ্চিত করলেন, মানুষের মনের এ অবস্থা মুনাফিকি নয়; বরং এটাই স্বাভাবিক মানবীয় প্রকৃতি। মানুষের স্বভাবই হলো স্মরণ করা আর ভুলে যাওয়া। তাই মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। কারণ, মানুষ ফেরেশতা নয়।

অন্য একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন—

‘প্রতিটি সৎকর্মই এক-একটি সাদাকা (দান), অসৎ কাজ থেকে মানুষকে নিষেধ করা একটি সাদাকা, তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করাও সাদাকা।’ সাহাবিরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘কেউ যদি স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করে, এর জন্যও কি পুরস্কৃত হবে?’ রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বললেন—‘আচ্ছা বলো তো, কেউ যদি অবৈধ পন্থায় যৌন আকাজক্ষা চরিতার্থ করে, তাহলে কি তার গুনাহ হবে না? সুতরাং কেউ যদি বৈধ পন্থায় যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে, তাহলে এর জন্য সে পুরস্কৃত হবে।’^{১৫}

১১. বুখারি

১২. মুসলিম

১৩. বুখারি

১৪. মুসলিম

১৫. বুখারি ও মুসলিম

দায়মুক্তি

হজ সম্পন্ন হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় ফিরে গেলেন। মদিনার দৈনন্দিন জীবন এগিয়ে চলল। মুসলিমরা দ্বীনের শিক্ষা প্রদান ও শিক্ষা গ্রহণের কাজে মনোযোগ নিবদ্ধ করল। ওহির নির্দেশ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাতলানো পথে জাকাত প্রতিষ্ঠিত হলো।^{১৬} এভাবে ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি সংহত রূপ লাভ করল—যার মধ্যে অন্যতম ভিত্তি ‘হজ’। মুসলিমরা সঠিক নিয়ম অনুসারে মাত্রই সম্পন্ন করেছে। মুসলিমরা তাদের দৈনন্দিন জীবন কীভাবে পরিচালনা করবে, ভবিষ্যতের নতুন নতুন প্রশ্নের সমাধান কীভাবে সমাধা করবে, তার শিক্ষা নবিজির কাছ থেকে গ্রহণ করতে লাগল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়েমেনের বিচারকাজ পরিচালনার জন্য প্রেরণ করলেন। মুয়াজ ইবনে জাবাল রওয়ানা করার পূর্বে নবিজি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—

‘তুমি কী দিয়ে বিচারকার্য চালাবে?’ তিনি জবাবে বললেন— ‘আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে।’ নবিজি আবার প্রশ্ন করলেন—‘যদি তুমি আল্লাহর কিতাবে তা খুঁজে না পাও?’ মুয়াজ (রা.) বললেন— ‘আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ অনুযায়ী বিচার করব।’ নবিজি আবার প্রশ্ন করলেন—‘যদি তুমি রাসূলুল্লাহর সুন্নাহর ভেতরেও কিছু না পাও?’

মুয়াজ (রা.) আত্মবিশ্বাসের সাথে বললেন—‘আমি আমার চেষ্টা দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করব না।’ এ উত্তর শুনে নবিজি খুশি হলেন। বললেন—‘সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর রাসূলের বার্তাবাহককে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন—যা আল্লাহর রাসূলকে সন্তুষ্ট করেছে।’^{১৭}

মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)-এর উত্তরের ভেতর নবিজির যে শিক্ষা নিহিত রয়েছে, তা যুগ যুগ ধরে ইসলামের নীতি-নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ হলো ইসলামের মৌলিক দুটি দলিল। যদি এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, যার সমাধান উপরিউক্ত দুটিতে পাওয়া যায় না, তাহলে মানুষ তাদের প্রজ্ঞা, সাধারণ জ্ঞান ও আইনগত সৃষ্টিশীলতা দিয়ে ওই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নেবে—যা হবে একই সঙ্গে ইসলামের মূলনীতি এবং নতুন পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। ইসলামের মৌলিক নীতিমালা (আল আকাইদ) এবং অনুশীলন পদ্ধতি (ইবাদত) পরিবর্তনশীল নয়। কিন্তু নতুন পরিস্থিতির নতুন প্রশ্ন—যার উত্তর কুরআন ও সুন্নাহতে নেই অথবা অস্পষ্টভাবে আছে, পরিস্থিতির আলোকে সে প্রশ্নের নতুন উত্তর খুঁজে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। সাহাবিরা এ বিষয়টিকে ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবিদের ভেতর এতখানি জ্ঞান, প্রশিক্ষণ ও আত্মবিশ্বাস প্রোথিত করে দিয়েছিলেন যে, পরবর্তী সময়ে তাঁরা দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে, দুনিয়ার মানুষের নানা উত্থান-পতনের দৃশ্যের সাক্ষী হয়েছে, কিন্তু চলমান পরিস্থিতির সাথে ইসলামকে মানিয়ে নিতে তাঁদের কোনো সমস্যা হয়নি।

১৬. অধিকাংশ বর্ণনা ও বেশিরভাগ স্কলারের মতে, নবম হিজরিতে জাকাত প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৭. তিরিমিজি, আবু দাউদ

প্রাণ ও প্রকৃতির সুরক্ষা

মদিনা থেকে ফেরার কয়েক মাস পর হিজরতের একাদশ বছরে রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরাঞ্চলে মুতা ও ফিলিস্তিনের কাছাকাছি এলাকায় একটি অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিলেন। কয়েক বছর পূর্বে এ জায়গাতেই জাফর, আবদুল্লাহ ও জায়েদ (রা.) শহিদ হয়েছিলেন। সবাইকে অবাধ করে দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবারের অভিযানের নেতৃত্ব তুলে দিলেন শহিদ জায়েদ (রা.)-এর মাত্র ২০ বছর বয়সি পুত্র ওসামা (রা.)-এর হাতে; অথচ তিন হাজার শক্তিশালী সেনাসংবলিত এ বাহিনীতে উমর (রা.)-এর মতো বহু অভিজ্ঞ ও ঋদ্ধ সাহাবিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।^{১৮}

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ সিদ্ধান্ত নিয়ে সাহাবিদের মধ্যে গুঞ্জন তৈরি হলো। সমালোচনা বৃদ্ধি পেলে তা তাঁর কানেও এসে পৌঁছাল। তিনি দ্রুত এর সমাপ্তি টানলেন। বললেন—‘আজ তোমরা মুসলিম সেনাবাহিনীর নেতা হিসেবে উসামার নিয়োগের সমালোচনা করছ, এমনভাবে তোমরা তাঁর পিতা জায়েদের ক্ষেত্রেও সমালোচনা করেছিলে। উসামা সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ার মতো উপযুক্ত বলে আমি বিশ্বাস করি, যেভাবে তাঁর পিতাও উপযুক্ত ছিল।’^{১৯}

অতীতে মুসলিম বাহিনীর নেতা হিসেবে জায়েদ (রা.)-এর মনোনয়নকে কতক মুসলিম সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেছিল এজন্য যে, পূর্বে তিনি একজন দাস ছিলেন। উসামা (রা.)-এর ক্ষেত্রে অসন্তোষের একটি কারণ ছিল, তিনি ছিলেন দাসের পুত্র এবং অন্য কারণ ছিল—তাঁর অল্প বয়স। নেতা নির্বাচনে নবিজির এ নীতির মধ্যে এ শিক্ষা নিহিত রয়েছে যে, যদি কেউ উপযুক্ত ধর্মীয়, জ্ঞানগত, নৈতিক যোগ্যতায় উত্তীর্ণ হয়, তাহলে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তার সামাজিক মর্যাদা বা বয়স কোনো বাধা হতে পারে না। একজন দরিদ্র তরুণকে নেতা হিসেবে বেছে নেওয়ার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন সাম্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, যেন সবাই তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখার উৎসাহ পায়। এ ঘটনা ছিল বয়স্ক ও অভিজ্ঞ সাহাবিদের জন্য শিক্ষণীয়। ছেলের বয়সি একজন নেতার নেতৃত্ব মেনে নেওয়া ছিল তাঁদের জন্য নিজের আত্ম-অহংয়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করার শামিল। এ ছাড়াও এটি ছিল বয়স্ক সাহাবিদের জন্য এই শিক্ষা যে, সময়ের আবর্তনে মানুষের শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাই সবাইকে বাস্তবতা মেনে নিতে হবে এবং তরুণ ও শক্তিশালী নেতৃত্বের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে অভ্যস্ত হতে হবে।

নবিজি তরুণ উসামা (রা.)-কে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিলেন এবং যাত্রা শুরু নির্দেশ দিলেন। কিন্তু হঠাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, ফলে যাত্রা শুরু হতে দেরি হলো। মদিনার কাছে মুসলিম সেনাবাহিনী নবিজির সুস্থতার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কয়েক দিন পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইচ্ছা অনুযায়ী আবু বকর (রা.) ওসামা (রা.)-কে অভিযান শুরু করতে বললেন। তিনি ওসামা (রা.)-কে ইসলামের যুদ্ধনীতি, বিশেষ করে শত্রুদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে, সে সংক্রান্ত নীতিমালা মেনে চলার কথা মনে করিয়ে দিলেন।

১৮. কিছু কিছু বর্ণনামতে, এ অভিযানে আবু বকর, উসমান ও আলি (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

১৯. ইবনে হিশাম

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ সিদ্ধান্ত নিয়ে সাহাবিদের মধ্যে গুঞ্জন তৈরি হলো। সমালোচনা বৃদ্ধি পেলে তা তাঁর কানেও এসে পৌঁছাল। তিনি দ্রুত এর সমাপ্তি টানলেন। বললেন—‘আজ তোমরা মুসলিম সেনাবাহিনীর নেতা হিসেবে উসামার নিয়োগের সমালোচনা করছ, এমনভাবে তোমরা তাঁর পিতা জায়েদের ক্ষেত্রেও সমালোচনা করেছিলে। উসামা সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ার মতো উপযুক্ত বলে আমি বিশ্বাস করি, যেভাবে তাঁর পিতাও উপযুক্ত ছিল।’^{২০}

অতীতে মুসলিম বাহিনীর নেতা হিসেবে জায়েদ (রা.)-এর মনোনয়নকে কতক মুসলিম সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেছিল এজন্য যে, পূর্বে তিনি একজন দাস ছিলেন। উসামা (রা.)-এর ক্ষেত্রে অসন্তোষের একটি কারণ ছিল, তিনি ছিলেন দাসের পুত্র এবং অন্য কারণ ছিল—তাঁর অল্প বয়স। নেতা নির্বাচনে নবিজির এ নীতির মধ্যে এ শিক্ষা নিহিত রয়েছে যে, যদি কেউ উপযুক্ত ধর্মীয়, জ্ঞানগত, নৈতিক যোগ্যতায় উত্তীর্ণ হয়, তাহলে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তার সামাজিক মর্যাদা বা বয়স কোনো বাধা হতে পারে না। একজন দরিদ্র তরুণকে নেতা হিসেবে বেছে নেওয়ার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন সাম্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, যেন সবাই তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখার উৎসাহ পায়। এ ঘটনা ছিল বয়স্ক ও অভিজ্ঞ সাহাবিদের জন্য শিক্ষণীয়। ছেলের বয়সি একজন নেতার নেতৃত্ব মেনে নেওয়া ছিল তাঁদের জন্য নিজের আত্ম-অহংয়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করার শামিল। এ ছাড়াও এটি ছিল বয়স্ক সাহাবিদের জন্য এই শিক্ষা যে, সময়ের আবর্তনে মানুষের শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাই সবাইকে বাস্তবতা মেনে নিতে হবে এবং তরুণ ও শক্তিশালী নেতৃত্বের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে অভ্যস্ত হতে হবে।

নবিজি তরুণ উসামা (রা.)-কে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিলেন এবং যাত্রা শুরু নির্দেশ দিলেন। কিন্তু হঠাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, ফলে যাত্রা শুরু হতে দেরি হলো। মদিনার কাছে মুসলিম সেনাবাহিনী নবিজির সুস্থতার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কয়েক দিন পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইচ্ছা অনুযায়ী আবু বকর (রা.) ওসামা (রা.)-কে অভিযান শুরু করতে বললেন। তিনি ওসামা (রা.)-কে ইসলামের যুদ্ধনীতি, বিশেষ করে শত্রুদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে, সে সংক্রান্ত নীতিমালা মেনে চলার কথা মনে করিয়ে দিলেন।

আবু বকর (রা.) তাঁকে বললেন—‘নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের রক্তে তোমার হাত রঞ্জিত করবে না (অর্থাৎ তাদের হত্যা করবে না)। বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে না। কারও অঙ্গচ্ছেদ করবে না। গাছপালা, ঘরবাড়ি ও শস্যখেত ধ্বংস করবে না। কোনো ফলবান গাছ কতন করবে না। নিজেদের খাদ্যের জন্য ছাড়া পশু-পাখিকে হত্যা করবে না। ... পথে তোমার সামনে কিছু আশ্রম পড়বে, যেখানে সন্ন্যাসীরা নির্জনে আল্লাহর উপাসনা করছে। তাদের একা থাকতে দেবে, তাদের হত্যা করবে না, আশ্রমগুলোকে ধ্বংস করবে না।’^{২১}

এই শিক্ষাগুলো ছিল খুবই প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান, যা বিভিন্ন সময় নবিজি তাঁর সাহাবিদের শিক্ষা দিয়েছেন—শত্রুদের নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের প্রতি শ্রদ্ধা, অন্য ধর্মের নিরপরাধ ধর্মগুরুদের নিরাপত্তা বিধান করা এবং পশু-পাখি ও প্রকৃতির সুরক্ষা নিশ্চিত করা। রাসূল ﷺ-এর প্রতিষ্ঠিত এ যুদ্ধনীতিগুলোই সংক্ষেপে আবু বকর (রা.)-এর কথায় উচ্চারিত হয়েছে।

এর কয়েক বছর পূর্বে হুলাইনের যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ হঠাৎ দেখলেন, একদল লোক একজন নারীর মৃতদেহকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি কাছে গিয়ে জানলেন, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) (যিনি কিছুদিন আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন) তাকে হত্যা করেছেন। নবিজি এ কথা শুনে রাগান্বিত হলেন এবং তাঁকে বলে পাঠালেন—‘রাসূলুল্লাহ ﷺ শিশু, নারী ও দাসদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।’^{২২} এ ছাড়াও তিনি একবার খালিদ (রা.)-এর প্রতি রাগান্বিত হয়েছিলেন এ কারণে যে, যুদ্ধের সময় ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও তিনি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। উভয় ঘটনাতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা ছিল একই রকম। একজন ব্যক্তি শুধু তার শত্রুসেনার সাথেই লড়াই করতে পারে, কিন্তু যারা সরাসরি যুদ্ধে জড়িত নয়—এমন বেসামরিক ব্যক্তির জান-মালের ক্ষতিসাধন করা কোনোভাবেই বৈধ নয়। মুতা অভিযানে সেনাবাহিনী প্রেরণের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ স্পষ্টভাবে বলেছেন—‘তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, প্রতারণা করবে না, মানুষের অঙ্গহানি করবে না এবং শিশু ও আশ্রমের সন্ন্যাসীদের হত্যা করবে না।’^{২৩}

যুদ্ধ মুসলিমদের কাছে আকাজক্ষিত নয়, কিন্তু আক্রান্ত হলে অথবা নিজেদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়লে তারা যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়। তবে সেক্ষেত্রে মুসলিমদের যুদ্ধনীতি হলো—কেবল তাদের সাথেই লড়াই করা, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে কিংবা যারা লড়াই করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যদি শত্রুরা আত্মসমর্পণ করে বা শান্তি কামনা করে, তাহলে কুরআনের বক্তব্য মতে যুদ্ধ থামাতে হবে।

‘তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তুমিও তার দিকে ঝুঁকে পড়ো। আর আল্লাহর ওপর নির্ভর করো। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।’^{২৪}

আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধনীতির ক্ষেত্রে শুধু একবার ব্যতিক্রম করেছেন—যা ঘটেছে বনু নাজির গোত্রের দুর্গ অবরোধের সময়। সেই ব্যতিক্রম ঘটনাটি কুরআনে উল্লেখিত হওয়ার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, যুদ্ধের সময় প্রকৃতির সুরক্ষার ওই নীতি মুসলিমদের জন্য অবশ্য পালনীয়। রাসূল ﷺ খেজুর গাছ, অন্যান্য ফলদায়ক গাছ ও শাকসবজির বাগানকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য মুসলিমদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। একদিন সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) অজু করছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অজুর দৃশ্য দেখে বললেন—

২২. ইবনে হিশাম

২৩. ইবনে হাম্বল

২৪. সূরা আনফাল : ৬১

‘এত অপচয় কেন, হে সাদ?’ সাদ (রা.) প্রশ্ন করলেন—‘অজুর মধ্যেও কি অপচয় আছে?’ নবিজি জবাবে বললেন—‘হ্যাঁ; তুমি যদি প্রবাহিত নদীর পানি থেকেও অজু করো, সেখানেও অপচয় আছে।’^{২৫}

পানি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। কারণ, মুসলিমরা পানি দিয়ে অজু-গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করে ইবাদতের জন্য প্রস্তুত হয়।^{২৬} রাসূল ﷺ পানির মতো সাধারণ একটি উপাদানকেও যত্নের সাথে ব্যবহার করতে বলেছেন। অপচয় করতে নিষেধ করেছেন। এভাবে তিনি প্রকৃতির সুরক্ষার দিকে মুসলিমদের মনোযোগ দিতে উৎসাহিত করেছেন। বলেছেন—‘যদি তোমার এক হাতে একটি চারাগাছ থাকা অবস্থায় কিয়ামত হয়, তাহলে দ্রুত এটি রোপণ করে দাও।’ রাসূল ﷺ মুমিনদের শিখিয়েছেন, জীবনের শেষ মুহূর্তেও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার নীতি মেনে চলতে।

পশু-পাখির প্রতিও নবিজি এমন ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন। মক্কার দিকে সেনাবাহিনী নিয়ে মার্চ করার সময় যখন কয়েকটি কুকুরছানা তাঁর নজরে এলো, তখন তিনি কুকুরছানাগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য একজনকে দায়িত্ব দিলেন। যুদ্ধের মতো চূড়ান্ত পরিস্থিতিতেও তিনি পশুদের প্রতি যত্নবান ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে বিড়াল ভালোবাসতেন, কিন্তু তিনি সব পশু-পাখির প্রতি যত্নবান হতে তাঁর সাহাবিদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন।

২৫. আহমদ, ইবনে মাজাহ

২৬. এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—‘যখন মুমিন অজু করে এবং তার মুখ ধৌত করে, তখন সে তাঁর চোখ দিয়ে যত গুনাহ করেছে, তা মুছে যায়। যখন সে হাত ধৌত করে, তখন হাত দ্বারা সাধিত সকল গুনাহ মোচন করা হয়, যখন সে পা ধৌত করে, তখন পা দ্বারা সংঘটিত সকল গুনাহ মুছে যায়। এভাবে তাঁর সকল গুনাহ মুছে যায়।’ আবু দাউদ